(ii) শিক্ষা হবে সমগ্র জীবনব্যাপী। দৈহিক, মানসিক
ভারতবাসী সমাজের পরিবর্তনসাধনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে
(iii) শিক্ষা ও কর্ম সংস্থানের মধ্যে সংগতি রক্ষা করতে হবে। ভারতে একজনও শিক্ষিত
বেকার থাকবে না। এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করতে না পারলে ভারতীয় অর্থনীতি ও
সমাজনীতি কখনোই সুস্থ পরিবেশে গড়ে উঠতে পারবে না।
(iv) শিক্ষা-প্রকল্পসমূহের সফল রূপায়ণ ব্যতীত ভারতে গণতন্ত্র, জাতীয় সংহতি, ধর্ম
নিরপেক্ষতা ও শ্রমের মর্যাদাদান কখনোই সফল হতে পারবে না।
কার্যকরী সংস্থার এই মৌলিক লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে ভারতের ষষ্ঠ পরিকল্পনায়
শিক্ষা-প্রকল্প রচিত হয়েছে।

## ২.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬ (National Education Policy, 1986) :

### ❖ ২.৪.১ জাতীয় শিক্ষানীতি (National Policy on Education) :

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং
শিক্ষাক্ষেত্রে এক নব দিগন্তের সূচনা ঘটে। রাজীব গান্ধির মতে আগামী শতক হল বিজ্ঞান
ও প্রযুক্তিবিদ্যার শতক, তিনি বলেন বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে
ভারতের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্ত ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ও
মানবসম্পদের যথার্থ ব্যবহার। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নির্ভর করে মানবসম্পদের
ওপর আর মানব সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি গতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা।
তিনি একটি গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের উপর জোর দেন। একটি নতুন জাতীয়
শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫, আগস্টে রাজীব গান্ধি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের এক
সম্মেলন আহ্বান করেন, দেশের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি
নিজেদের সকল শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহমতের ভিত্তিতে "Challenge of Edu-
cation : A Policy Perspective" নামে একটি আলোচনাপত্র প্রকাশ করেন।

এই প্রচার মতে আলোচনাপত্রে দেশের তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা, শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপ
ও সরকারি ইচ্ছার কথা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা হয়।

দেশজুড়ে বিতর্ক ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সারা দেশের
বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, চিন্তানুরাগী ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি উল্লিখিত আলোচনা
পত্রে দেশের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এই অভিমতের
ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা প্রদত্ত মূল্যায়ন ভিত্তিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে
ভারত সরকার ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করে।
CABE উক্ত খসড়া (জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া) প্রস্তাবটি বিচার বিশ্লেষণ করে তা অনুমোদন

করে এবং এটিকে গ্রহণের সুপারিশ করে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে পাঠান। **জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ** (National Development Council) তা অনুমোদন করার পর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিলটি সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত হয়।

২৯ পৃষ্ঠা, ৭টি বিভাগ সমন্বিত এই দলিলে বিস্তৃত আছে— শিক্ষার সাম্প্রতিক ছবি, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকার ঘোষিত জাতীয় শিক্ষানীতি ১২টি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অংশের একটা শিরোনাম দেওয়া হয়েছে।

**জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৮৬) — প্রাক্-শৈশবের শিশুপালন ও শিক্ষা, সার্বজনীন সাক্ষরতা, প্রারম্ভিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং নবোদয় বিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষণ, বৃত্তি শিক্ষা, প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা, মূল্যায়ন, নারী শিক্ষা, তপশিলি জাতির শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যেসব প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল—**

### ❖ ২.৪.২ জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি (Nature of National Education) :

(i) ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রকৃতি নির্ধারিত হবে। শিক্ষার একটি ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করাই হবে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কাজ।

(ii) সারা দেশে ১০+২+৩ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা যে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হবে ৫+৩+২। ৫ বছর নিম্ন-প্রাথমিক স্তর, ৩ বছরের উচ্চ-প্রাথমিক ও ২ বছরের উচ্চ বিদ্যালয় স্তর। ১৯৯২ তে জাতীয় শিক্ষানীতির পর্যালোচনা Report -এ বলা হয়েছিল ১০ বছরের পর +২ স্তরকে সারাদেশে বিদ্যালয় শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে ধরতে হবে। অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষা হবে '১০+২' বছরের।

(iii) জাতীয় শিক্ষার জন্য একটি জাতীয় পাঠক্রমের রচনা করা হবে। জাতীয় ভিত্তিতে রচিত পাঠক্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। সকলের জন্য পাঠক্রমে National core curriculum (আবশ্যিক জাতীয় পাঠক্রম) এবং ঐচ্ছিক পাঠক্রম (Elective curriculum) থাকবে। আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে থাকবে– ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস, সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয়। অর্থাৎ আবশ্যিক পাঠক্রমে এমন-সব অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হবে। এবং আগামী দিনে ভারতীয় সমাজ তাদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। ঐচ্ছিক পাঠক্রমের

মধ্যে এমন সব অভিজ্ঞতা সংযোজিত হবে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত মূল্যবোধগুলি গড়ে উঠে এবং শিক্ষার্থীদের মনে আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত হয়।

(iv) প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা, যা এই শিক্ষানীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, তা দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রথাগত শিক্ষা ছাড়া জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ও মুক্ত এবং দূরাগত শিক্ষা ব্যবস্থা বা প্রচার শিক্ষা কৌশলগুলি ব্যবহার করবে।

(v) দায়িত্বভার পালন সম্পর্কেও নিশ্চিতভাবে কয়েকটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে হলে তাকে সঠিক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে কতকগুলি জাতীয় সংস্থার উপর। NCERT, NCTE, NIEPA, AICTE, ICAR, IMC (Indian Medical Council), IIST (International Institute of Science and Teaching) ইত্যাদি সংস্থাগুলির যৌথভাবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার তদারকি দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(vi) শিক্ষার প্রত্যেক পর্যায়ে, শিক্ষিত হিসেবে বিবেচিত হতে হলে কমপক্ষে কতটুকু পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে, তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে জাতীয় শিক্ষার মধ্যে (Maximum Level of Learning)।

(vii) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হয়। এটিকে সঠিক পথ দেওয়ার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি মন্তব্য করে--- রাজ্য সরকারগুলি পূর্বে, যেমন—শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্বপালন করত, সেইরকম দায়িত্ব বর্তমানেও পালন করবে, কেন্দ্রীয় সরকার মূলত শিক্ষার সর্বভারতীয় মান বজায় রাখার দিকে জাতীয় সংহতি বিষয়ে, শিক্ষার আন্তর্জাতিকতা তাৎপর্যের ব্যাপারে, উন্নত গবেষণার ক্ষেত্রে এবং জাতীয় চাহিদা অনুযায়ী মানবসম্পদ বিকাশে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সহযোগিতা রেখে কাজ করবে। শিক্ষার ব্যাপারে সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে যে যৌথ দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা জাতীয় স্বার্থের পটভূমিতে অর্থপূর্ণ অংশীদারীর ভিত্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তা পালন করবে।

### ❖ ২.৪.৩ প্রাক্-শৈশবের শিশুপালন ও শিক্ষা (Early Childhood Care and Education, ECCE) :

প্রত্যেক শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করাই হল জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে প্রাক্-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা (Early childhood Care and Edn.) কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রাক্-প্রাথমিক হবে শিশু শিক্ষার প্রথম স্তরকে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর না বলে প্রাক্-শৈশবের শিশুপালন ও শিক্ষাকাল বলা হল। এই সময়ের প্রথম দিকে লেখাপড়া শিক্ষার উপর জোর

দিতে হবে না। এই সময়ে শিক্ষাকে (Child Development Service Programme) শিশুবিকাশে প্রকল্প পরিষেবা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশুর পুষ্টি, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, দৈহিক, নৈতিক আবেগমূলক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য দেহ, মনকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

❖ **২.৪.৪ সার্বজনীন সাক্ষরতা, প্রারম্ভিক শিক্ষা** (Universal Literacy, Elementary Education) :

জাতীয় পুনর্গঠনের প্রাথমিক বা পূর্বশর্ত সংবিধানে ঘোষিত হয়েছিল যে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৬-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু নানা কারণে এই লক্ষ্য অর্জিত হয়নি, তাই ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলে-মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই শিক্ষা যেন সম্পূর্ণ হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে (Universal Enrolment and Retention)। দেশের সার্বিক উন্নয়নে সার্থকভাবে শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে হলে ধাপে ধাপে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মানের যথেষ্ট উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয় পরিবেশকে আকর্ষণীয় করতে হবে। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিকারমূলক সহযোজনা শিক্ষা (Supplimentary Remedial Instruction)-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে তারা অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে। উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রভৃতির অভাব। তাই শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য এইসব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। এর জন্য অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড-এর কথা সুপারিশ করা হয়। এই আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান-এর উন্নয়ন ঘটে।

❖ **২.৪.৫ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং নবোদয় বিদ্যালয়** (Secondary Education and Navodaya Vidyalaya) :

স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমাণগত সম্প্রসারণ যথেষ্ট ঘটলেও গুণগত উন্নয়ন তেমন হয়নি, এর মূলে রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, অর্থের অভাব, শিক্ষা সহায়ক উপকরণের অভাব, পাঠক্রমের যথোপযুক্ততার অভাব, সর্বজনীন শিক্ষা কাঠামোর অভাব। উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাও সেই সমস্যায় জর্জরিত অথচ জাতীয় উন্নয়নে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

❑ **নবোদয় বিদ্যালয়** (Navodaya Vidyalaya / Pace setting school) : গ্রামাঞ্চলের প্রতিভাসম্পন্নরা সুযোগের অভাবে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে না। শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে Model School স্থাপন করার কথা বলে। প্রস্তাবিত Model School গুলির নতুন নামকরণ হল "**Navodaya Vidyalaya**"। এই বিদ্যালয়গুলি উৎকর্ষতার কেন্দ্র রূপে 'Pace centre' (Pace setting school) কাজ করে। এই সব বিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের গুণগত শিক্ষা দেওয়া হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, লিঙ্গ, অঞ্চল নির্বিশেষে কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভরতি করা হবে। তপশিলি জাতি (SC), উপজাতি (ST) ও মেয়েদের জন্য (১/৩), গ্রামাঞ্চলের প্রতিভা সম্পন্ন মেয়েদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত থাকবে। বইপত্র, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয় সরকার বহন করবে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠনের ব্যবস্থা থাকবে। সহ-শিক্ষামূলক (Co-Education) ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তিনটি ভাষা– আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দি ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। অষ্টম ও নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দি ও ইংরেজি। জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী শিক্ষা দেওয়া হবে। সর্বাধুনিক সহায়ক উপকরণ যেমন— Tape recorder, Video, Caset player প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের আদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুষম বিকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা পরিচালিত হবে। কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে এটি প্রথমে চালু হয়। এখানে কলা, বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। অন্যান্য মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় একে অনুসরণ করবে।

### ❖ ২.৪.৬ উচ্চশিক্ষা (Higher Education) :

শিক্ষা পিরামিডের সর্বশীর্ষে রয়েছে উচ্চ শিক্ষা। একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে অনেকাংশে উচ্চশিক্ষার উপর, কাজেই উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ অবশ্যই প্রয়োজন। তথ্য বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার বিকাশ এমনভাবে ঘটাতে হবে যাতে তাতে জাতীয় উন্নয়ন সুনিশ্চিত হয়।

● বর্তমানে সারা ভারতে ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রায় ৫০০০ টি কলেজ আছে। অপরিকল্পিতভাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা না বাড়িয়ে উচ্চশিক্ষাকে সুসংহত ও শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে। অর্থাৎ সংখ্যাগত বৃদ্ধির পরিবর্তে দেশের বিশাল ১৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫ হাজারটি কলেজ তাদের গুণগত মান বজায় রাখতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এর জন্য কলেজগুলিতে সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে হবে (নতুন

কলেজ না খুলে)। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আরও শক্তিশালী করা দরকার।

❑ **স্বশাসিত কলেজ** (Autonomous College / Excellent College) : ১৯৮৬ -এর শিক্ষানীতির (উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে) একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্বশাসিত কলেজ বা উৎকর্ষ কলেজ (Autonomous / Excellent college)। এই শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে যে কলেজগুলিকে অনুমোদনের বর্তমান যে রীতি প্রচলিত আছে সে-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ভালো নয়, তাই কলেজগুলির দায়বদ্ধতা (Account ability) বৃদ্ধির জন স্বশাসিত কলেজ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে। ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নত দেশগুলিতে আমাদের দেশের মতো অনুমোদিত কলেজ নেই। আমাদের দেশেও এরকম ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হাভার্ড, ইয়েল, স্টানফোর্ড-এর মতো শিক্ষার মান উন্নয়নের চেষ্টা আমাদেরও করতে হবে।

স্বশাসিত কলেজগুলি হবে উৎকর্ষতার কেন্দ্র। নয়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, অনুমোদিত কলেজগুলি ভারতের উন্নতির পক্ষে প্রবল বাধা (ভারতব্যাপী অনুমোদিত কলেজ)। এই কলেজগুলির জন্য উচ্চশিক্ষার আধুনিকীকরণ সম্ভব হচ্ছে না। তাই নয়া শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে অনুমোদিত কলেজগুলি তুলে দিতে হবে। এদের স্বাধীনতা দিতে হবে এবং তার বদলে স্থাপন করতে হবে স্বশাসিত কলেজ বা Autonomous College।

এই কলেজগুলি কী পড়াবে, কীভাবে পড়াবে, কত ছাত্র ভরতি নেবে, ভরতির মানদণ্ড কী হবে, পরীক্ষা নেওয়া, ডিগ্রি দেওয়া, মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে প্রভৃতি নিজেরাই নির্ধারণ করবে। এই কলেজগুলি যারা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে তারাই হবে সর্বেসর্বা। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রীদের কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে না। শিক্ষাকর্মীদের কাজের শর্তাবলি পরিচালকমণ্ডলী তাদের ইচ্ছামতো স্থির করবে ও কর্মী নির্বাচন নিজেরাই করবে। শিক্ষাগত উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য পাঠ্যতম বিষয়, পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষক নির্বাচন, গবেষণা, পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংগঠনের সাহায্য নিতে পারবে।

(i) মঞ্জুরি কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকার একমত হয়ে উৎকর্ষ বা স্বশাসিত কলেজরূপে স্বীকৃতি দেবার জন্য নির্বাচন করবে।

(ii) Excellent এবং স্বশাসিত কলেজগুলি হবে প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট।

(iii) প্রথম পাঁচ বছরের জন্য কলেজগুলিকে স্ব-শাসন দেওয়া হবে। কলেজের কৃতিত্ব (Performance) বিচার বিবেচনা করে স্ব-শাসনের মেয়াদ বাড়ানো হবে, না হলে স্ব-শাসন কেড়ে নেওয়া হবে।

(iv) শুরুতে কেন্দ্রীয় সরকার এদের প্রত্যেককে অনুদান মঞ্জুর করবে, কিন্তু তারপর নিজেদের চেষ্টায় এদের খরচ চালাতে হবে, কাজও জোগাড় করতে হবে। স্বশাসিত

উৎকর্ষই কলেজগুলির বাড়তি প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রতিবছর মঞ্জুরি কমিশন থেকে অনুমোদন দেওয়া হবে।

(v) ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ৫০০ কলেজে স্বশাসিত উৎকর্ষ কলেজরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

(vi) নিজেদের পাঠক্রম সিলেবাস, পাঠক্রম বিষয়, পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিয়োগ, কর্মনীতি নির্ধারণ, ডিগ্রি প্রদান কলেজ নিজে নির্ধারণ করবে।

(vii) উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতিভাবানরাই প্রবেশাধিকার পাবে, বুদ্ধি ও প্রবণতার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে ছাত্র ভরতি হবে। উচ্চশিক্ষার প্রবেশাধিকার হবে নিয়ন্ত্রিত।

(viii) প্রত্যেক রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার সংসদ (Council of Higher Education) স্থাপন করা হবে। এর উপর উচ্চ শিক্ষা ও সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। UGC + Higher Education Council উচ্চশিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

(ix) শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ তথা উচ্চ শিক্ষার সুযোগসুবিধা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও দূরাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত (IGNOU) ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

**অন্যান্য :**

(i) উচ্চশিক্ষাকে রাজনীতি মুক্ত করতে হবে, এর জন্য UGC কে আরও ক্ষমতা দিতে হবে।

(ii) শিক্ষকের আচরণ বিধি তৈরি করতে ও পালন করতে হবে।

(iii) শুধুমাত্র গবেষণাগারের জন্য অর্থ সাহায্য করা হবে। অন্যান্য বিষয়ে অর্থাৎ যারা গবেষণার বাইরে পড়াশোনা করবে, তাদের অর্থ ব্যয় করে পড়াশোনা করতে হবে।

### ❖ ২.৪.৭ শিক্ষক (Teacher) :

মর্যাদার বিচারে শিক্ষক সমাজ সকলের ঊর্ধ্বে। জাতি ও সমাজগঠনে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক। সমাজ ও সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে— শিক্ষকদের মনে এই দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য। শিক্ষকদের নিয়োগ পদ্ধতি ঢেলে সাজাতে হবে। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। মেধা ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে পক্ষপাতহীনভাবে (objectively) শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পেশাগত ও সামাজিক দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে এমনভাবে শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরির শর্তাবলি নির্ধারণ করতে হবে যাতে দেশের প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীরা এই পেশা গ্রহণে উৎসাহী হয়। সারা দেশে শিক্ষকদের সমবেতন কাঠামো (Uniform pay Structure) ও একরকম চাকুরির সুযোগসুবিধার (Service

Conditions) ব্যবস্থা চালু করা দরকার। মাঝে মাঝে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়নের জন্য একটি মুক্ত মূল্যায়ন (Open Evaluation System) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষকদের পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা হবে। শিক্ষকরা সর্বদা শিক্ষামূলক কর্মসূচির সঠিক রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবেন। শিক্ষকদের জাতীয় সংগঠনগুলির সহায়তায় জাতীয় পর্যায় শিক্ষকদের জন্য একটি (Code of conduct) আচরণবিধি প্রণয়ন করা হবে।

❖ **২.৪.৮ শিক্ষক-শিক্ষণ** (Teacher Education) :

শিক্ষক শিক্ষা হল একটি চলমান প্রক্রিয়া (Continuous Process)। এই কারণে শিক্ষক শিক্ষার (Teacher Education) নতুন কর্মসূচিতে 'Continue Education' এর উপর জোর দিতে হবে। Pre-service এবং Inservice-এর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক, প্রথাবহির্ভূত ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য DIET (District Institute of Teacher Education) স্থাপন করতে হবে। এই রকম সমকালীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলে দিতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য স্থাপিত খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানকে উন্নতি ঘটিয়ে SCERT-এর মর্যাদা দিতে হবে। এর কাজ হবে Pre-service এবং Inservice - Teacher Training Programme-এর তরান্বিত করা। এই সংস্থাগুলি Teacher Training College ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Education Department-এর সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করবে। সারা দেশে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন, পাঠক্রম পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শদান ও শিক্ষক-শিক্ষণের মান বজায় রাখার জন্য NCTE স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষণের অবিচ্ছিন্ন (Continue Education) কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

❖ **২.৪.৯ বৃত্তি-শিক্ষা** (Vocational Education) :

নতুন শিক্ষানীতিতে বৃত্তিশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৃত্তিশিক্ষার জন্য চাই পরিকল্পিত কর্মসূচি ও তার বাস্তব রূপায়ণ। বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকার গ্রাম্য মেয়েদের তপশিলি জাতি ও উপজাতি, সমাজের বঞ্চিত গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি এর উপর নজর রেখে বৃত্তিশিক্ষার পরিকল্পনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। বৃত্তিশিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে New Job Opportunity Open হবে। Individual Employability বাড়বে। দশম শ্রেণি পাস করার পর বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হবে। অষ্টম শ্রেণি পাসের পরও এই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। নতুন শিক্ষানীতিতে আরও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে ১৯৯০-এর মধ্যে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ১০%, ১৯৯৫-এর মধ্যে ২৫% বৃত্তি শিক্ষাক্রমের আওতায় আনতে হবে। ১৯৯২-এর সংশোধিত নীতিতে এই লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১০%, ১৯৯৫-এর মধ্যে এবং ২৫% ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

বৃত্তিশিক্ষার জন্য IIT (সরকারি দায়িত্বে) সংস্থা খোলা হবে। শিক্ষা প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলি পাঠক্রমের নতুনত্ব আনতে সাহায্য করবে। বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা উভয়কে নিতে হবে। শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের সংস্থান সংবৃদ্ধির জন্য এইরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। মেয়েদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তিশিক্ষার পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে। বৃত্তিমুলক শিক্ষায় স্নাতকের পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি, চাকুরিরত উন্নতি প্রভৃতির জন্য আরও উন্নত পাঠক্রমের ব্যবস্থা থাকবে।

❖ **২.৪.১০ প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা** (Non-Fomal Education) :

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে যাদের বয়স ১১ বছর হবে তারা যাতে ইতিমধ্যে ৫ বছরের শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ করতে পারে সেইজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৪ বছর বয়সের সব ছেলে-মেয়েদের যাতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। শিশুশ্রমিক, মহিলা যেসব ছেলে-মেয়েরা ১৪ বছরের বয়সের আগে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, যে অঞ্চলে বিদ্যালয় নেই বা যেসব ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সে বৃত্তিতে নিয়োজিত হয়, তাদের জন্য প্রথাবহির্ভূত (Non-formal Eduation) ব্যবস্থা করতে হবে এবং এর পাঠ্যক্রম জাতীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হবে।

যারা ৬-১৪ বছর বয়সের আগে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, যারা প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পায় নি, শিশুশ্রমিক যারা অল্প বয়সে চাকরি নিয়েছে, যেখানে বিদ্যালয় নেই, তাদের জন্য Non-formal Education-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এদের পাঠ্যক্রম জাতীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে তুলতে হবে।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহৃত হবে। স্থানীয় যুবক-যুবতীরা এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকতা করবে। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। মূলত পঞ্চায়েত ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সাহায্যে এই শিক্ষাগুলি পরিচালিত হয়।

❖ **২.৪.১১ মূল্যায়ন** (Evaluation) :

প্রাথমিক স্তরে 'No Dention Policy' অনুসৃত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে মতামত দেয়। পরীক্ষা হবে নৈর্ব্যক্তিক, নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ। পরীক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রভাব (Subjectivity or Biasness) কমাতে হবে। অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন-উত্তর বাদ দিতে হবে। মুখস্থ রীতি বাতিল করতে হবে, নম্বরের পরিবর্তে গ্রেডের প্রথা চালু করতে হবে। বহিঃপরীক্ষার প্রাধান্য (শিক্ষার নিম্ন থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত) কমিয়ে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে semister প্রথা চালু

করতে হবে। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা তুলে দেওয়া হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে অধ্যাপকরা ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, তাঁরাই পরীক্ষা নেবেন।

### ❖ ২.৪.১২ নারীশিক্ষা (Women Education) :

নারীশিক্ষা ব্যাপারে ১৯৮৬-এর জাতীয় শিক্ষা নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ স্বাধীনতার পর অনেক কমিটি, কমিশন গঠিত হয়েছিল, কিন্তু নারীশিক্ষা বিষয়ে সেখানে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না বা পরিকল্পনা রূপায়ণে ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তাই বলা যায় ১৯৮৬-এর শিক্ষানীতি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে 'মাইল ফলক'।

১৯৮৬-এর জাতীয় শিক্ষা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল— শিক্ষার অসাম্য দূর করা। আমাদের দেশে শিক্ষার দিক থেকে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। এই অসাম্য দূর করার জন্য ১৯৮৬-এর জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলি হল—

(i) ১৯৮৬-এর শিক্ষা নীতিতে বলা হয় শিক্ষাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে যা নারীদের সমাজে মর্যাদা ও ক্ষমতায়নে সাহায্য করবে।

(ii) নারীদের শিক্ষার জন্য সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি, সমাজে বিভিন্ন স্তরে থেকে উৎসাহ দিতে হবে।

(iii) নারীদের মধ্যে নতুন মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে যার মাধ্যম হবে পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষিত শিক্ষক, শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের যুক্তকরণ।

(iv) নারীদের উন্নতির জন্য, তারা যাতে বিভিন্ন পেশাগত কোর্সে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) মেয়েরা যে সমস্ত পেশায় সাধারণত যোগ দেয় না, সেগুলিতেও যাতে যোগ দেয় তার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। যেমন— প্রযুক্তিবিদ্যা।

(vi) নারীশিক্ষার পথে বাধাগুলি দূর করার জন্য শিক্ষায় নারীদের সকলের প্রবেশকে সুনিশ্চিত করতে হবে, প্রাথমিক শিক্ষায় যাতে সকলকে ধরে রাখা যায় এবং দারিদ্র্য যাতে কোনো বাধা না হয়ে দাঁড়ায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(vii) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নারীশিক্ষা উন্নতির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

(viii) নারীরা যাতে বৃত্তিগত, পেশাগত এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার উপর জোর দিতে হবে।

(ix) নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যেসমস্ত সমস্যাগুলি আছে তা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি ইউনিট সৃষ্টি করতে হবে।

(x) রাজ্যস্তরে নারীশিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন মহিলা জয়েন্ট ডিরেক্টর নিযুক্ত করতে হবে।

(xi) প্রাথমিক স্তরে Operation Black Board কর্মসূচিতে নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য অধিক পরিমাণ নারীশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(xii) নারীদের জন্য সাধারণ পাঠক্রমের পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে থাকবে সূচিকর্ম, শিল্প, অঙ্কন, হস্তশিল্প প্রভৃতি।

(xiii) বয়স্ক মহিলাদের জন্য সাবলম্বীমূলক বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে।

(xiv) রাজ্য স্তরে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন Supporting Staff নিযুক্ত করতে হবে।

(xv) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীশিক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

❖ **২.৪.১৩ তপশিলি জাতির শিক্ষা** (Education of Scheduled Caste) :

নয়া শিক্ষানীতির মূল বক্তব্য হল— শিক্ষার সকল স্তরে তপশিলি জাতি ও তপশিলি বহির্ভূত অন্যান্য জাতির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। এদের অগ্রগতির জন্য কয়েকটি কর্মসূচি গৃহীত হয়—

(i) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় তার জন্য পরিবারগুলিকে উৎসাহ দান করা।

(ii) ঝাড়ুদার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির কর্মরত পরিবারের শিশুদের প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চ শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করা।

(iii) তফশিল জাতি থেকে শিক্ষক নিয়োগ।

(iv) তফশিল শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য হোস্টেলের সুবন্দোবস্ত করা।

(v) তফশিল শ্রেণির সুবিধামতো স্থানে বিদ্যালয়, শিশুঅঙ্গন এবং বয়সশিক্ষা সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত করা।

❑ **তপশিলি উপজাতিদের শিক্ষা** (Education of Scheduled Tribes) : উপজাতিদের অন্য সকলের সমকক্ষ করে তোলার জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে—

(i) আদিবাসী এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(ii) প্রারম্ভিক স্তরে পাঠক্রম এবং শিক্ষোপকরণ আদিবাসী ভাষায় রচনা করতে হবে এবং পরে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা নিতে যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) শিক্ষিত এবং সম্ভাবনাপূর্ণ আদিবাসী যুবকদের আদিবাসী এলাকায় শিক্ষকতা করার এবং প্রশিক্ষণ নেবার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

(iv) বহুসংখ্যক আবাসিক বিদ্যালয় ও আশ্রম বিদ্যালয় এইসব এলাকায় স্থাপন করতে হবে।

(v) তফশিল আদিবাসীদের বিশেষ ধরনের প্রয়োজন ও জীবনচর্চার দিকে লক্ষ রেখে কারিগরি এবং উচ্চতর পেশাগত শিক্ষায় বিশেষ বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে,

সঙ্গে সঙ্গে এদের সামাজিক-মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে শিক্ষার যাতে অগ্রগতি হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) আদিবাসী এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুঅঙ্গন (Anganwardis), প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র (Non-formal Centres) এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র (Adult Education Centre) স্থাপন করতে হবে।